যুগান্তর

তারিখ ২০ OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

ইন্টারনেট আসক্তি ও শিক্ষার মান

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের মতো এখন আর শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত গণ্য করা যায় না। শিক্ষা বিভাগে এখন নৈরাজ্য। এখানে প্রতি পদে দুর্নীতি। শৃংখলা ও সুশাসন নেই। এ নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা শিক্ষার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ছড়ানো। নিম্ন পর্যায়ের স্কুলশিক্ষা আজ আকর্ষণীয় বাণিজ্যক্ষেত্র। এ বাণিজ্য করে অনেক মুনাফা করা যায়। ইদানীং অনেক ব্যবসায়ী গার্মেন্ট ব্যবসার পরিবর্তে স্কুল ব্যবসায় বিনিয়োগ করছেন। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও রাজনীতিক থেকে শুরু করে এ ব্যবসায় অনেক মুনাফালোভী ব্যক্তি যুক্ত হয়েছেন। এমনকি বিদেশী দূতাবাসগুলো পর্যন্ত স্কুল ব্যবসায় জড়িত হয়েছে। আমেরিকা, কানাডা, তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরের মতো দূতাবাসগুলোও বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল পরিচালনা করছে। যেভাবে খুশি শিক্ষক নিয়োগ করছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো বেতন নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণ করে দেয়ার সাম্প্রতিক সরকারি সিদ্ধান্তটি ভালো হয়েছে। সরকার অনেক সময় শিক্ষা বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সে সিদ্ধান্তগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রের নিম্ন পর্যায়ে সম্প্রতি একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। সমস্যাটি হল, স্কুল শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট আসক্তি ও মোবাইল মাদকতা। টিনএজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যাটি মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমি একদিন একটি স্কুলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। শ্রেণীকক্ষে তখন ক্লাস চলছিল। খোলা জানালা দিয়ে দেখলাম শিক্ষক পাঠদান করছেন। কৌতূহলবশত শিক্ষার্থীদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, পেছনের বেঞ্চে ২-৩ জন ছাত্র মোবাইলে কী যেন দেখছে এবং হাসাহাসি করছে। ক্লাস ফাইভ-সিক্স-সেভেনের অনেক শিক্ষার্থীর হাতে এখন দামি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন। এরা প্রায় সব সময় অনলাইনে থাকে। ইন্টারনেটে যা খুশি তা-ই দেখে। এদের অনেকেরই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। কারণ, এরা গভীর রাত পর্যন্ত অনলাইনে সময় কাটায়। বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটিং করে এবং অনেক কিছু দেখে। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, আমাদের শিশু-কিশোররা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এতে তাদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের' গবেষণায় ঢাকায় স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৭৭ ভাগ নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিভাবকদের অবহেলা ও অসচেতনতা এবং শিশু-কিশোরদের জীবনদক্ষতার ঘাটতি থাকায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিকৃত যৌন শিক্ষা পেয়ে বেড়ে উঠছে। বিষয়টি ভয়াবহ।

শিক্ষার্থীরা যদি স্কুলে এসে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তারা ক্লাসে মনোযোগ দেবে কীভাবে? রাজধানীর একটি নামকরা স্কুলের দু'জন শিক্ষিকা ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাদের টিজ করার অভিযোগ এনে লিখিত দরখাস্ত করেছেন। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী সপ্তম শ্রেণীর কতিপয় ছাত্রের বিরুদ্ধেই ছিল শিক্ষিকাদের এ অভিযোগ। অভিযোগপত্রে তারা বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের দেখে শিস দেয়। তাদের উদ্দেশে আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ করে। প্রধান শিক্ষককে এমন অভিযোগের বিচার করতে হয়েছে। এমনিতেই স্কুল শিক্ষার্থীদের মান কমে যাচ্ছে। এসএসসি, এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার্থীর মান বাড়ছে না। এলাকার স্কুলগুলো এ বিষয়ে উদাসীন। আমার জানা মতে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের কিছুসংখ্যক নামিদামি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নেয়া নিষিদ্ধ। শিক্ষার্থীরা পরিবারে বা জরুরি প্রয়োজনে বাবা-মাকে ফোন করতে চাইলে তাদের স্কুলের ফোন ব্যবহার করতে দেয়া হয়। এরপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো শিক্ষার্থী স্কুলে মোবাইল ফোন এনে ধরা পড়লে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যদি এ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত নীতিমালা তৈরি করে তা সব স্কুলের জন্য মানা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হতো, তাহলে এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতো। শিক্ষার্থীদের পরিবারকেও এ বিষয়ে সতর্ক করা দরকার। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি এক-দু'মাস পরপর অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করে তাদের এ বিষয়ে সতর্ক করত, তাহলে পারিবারিক পরিবেশেও শিক্ষার্থীদের মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা যেত। আর এর ফলে স্কুলের একাডেমিক পরিবেশেরও উন্নতি হতো।

অভিভাবকরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে তাদের সন্তানদের বিদ্যার্জনের জন্য স্কুলে পাঠান। তারা চান তাদের সন্তান যেন বিদ্যার্জনে মনোযোগী হয় এবং সময়মতো প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোনো অভিভাবকই নিজ সন্তানকে মোবাইলে আপত্তিকর ছবি দেখতে বা অনলাইনে চ্যাটিং-ডেটিং করতে স্কুলে পাঠান না। শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিদের অনলাইনে প্রচারিত আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিয়ে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট না হয়, সেদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পরিবারের সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ২০০৮ সাল থেকে প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে যথাযথভাবে কাজ না করায় শিক্ষার্থীদের কোচিং ও নোট-গাইড নির্ভরতা কমেনি। তারপর মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্তি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায়ই কেবল ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, তাদের যৌনতা ও অপরাধের দিকে ধাবিত করছে। এ কারণে যুগপৎ শিক্ষাঙ্গনে ও সমাজে যৌন অপরাধ বাড়ছে। এ প্রক্রিয়ায় পরিমল জয়ধরের মতো কিছু কলঙ্কিত শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের কুপথে নিচ্ছে। এসব কারণে স্কুলের একাডেমিক পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

স্কুলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা যাতে ফেসবুক, ইউটিউব বা অনলাইন চ্যাটিং না করতে পারে সে বিষয়ে কিছু স্কুল সতর্ক পদক্ষেপ নিলেও মফস্বল শহর ও গ্রামীণ নিহত জঙ্গিদের বেশিরভাগ ছিল নামিদামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে শামিল হতে এদের অনেকেই জঙ্গিদের ইন্টারনেটে প্রচারিত আবেদনে কৌতূহলী হয়ে জঙ্গিবাদে যোগ দিয়েছে। পারিবারিক পরিবেশেও লেখাপড়া করার বাহানা সৃষ্টি করে টিনএজ ছেলেমেয়েরা যেন ঘরের দরজা বন্ধ করে অধিক রাত পর্যন্ত একাকী অনলাইনে থাকার সুযোগ না পায়, সেদিকেও অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পরিবারের উচিত টিনএজ ছেলেমেয়েদের বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রমে উৎসাহিত করা। তাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় উৎসাহ দেয়া। সর্বক্ষণ ঘরে থেকে ফোন বা ল্যাপটপে অনলাইনে সময় ব্যয় করার বদলে তাদের বাইরের মুক্ত বাতাসে চলাফেরায় উদ্বুদ্ধ করা। ক্লাব, সভা-সমিতির কার্যক্রম ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। নিজ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াও যাতে তারা সমাজে ছোট ও বড়দের সঙ্গে মিশতে পারে সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেয়া। আমরা এ কথা বলছি না যে, টিনএজদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। অথবা তাদের মোবাইল ফোন দেয়া যাবে না। আমরা যেটা বলছি তা হল, টিনএজ শিক্ষার্থীদের যেন ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের ভালোমন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। তারা যেন এসব আধুনিক প্রযুক্তির গঠনমূলক ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তির অপরিকল্পিত ও অসতর্ক ব্যবহারের বিপদাপদ সম্পর্কে যেন তাদের ধারণা থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ স্কুলে ও পরিবারে এ কাজটি করা হয় না। পরিবর্তে, কিশোর বয়সী শিক্ষার্থীদের কেবল ধমকানো হয়। শাস্তি দেয়া হয়। এটা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার, কিশোর বয়সী শিক্ষার্থীরা খুবই আবেগপ্রবণ। তাদের বেশি ধমকাধমকি করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ধমকাধমকির পরিবর্তে শিক্ষক বা অভিভাবক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর মতো সহানুভূতির সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দিলে শিক্ষার্থীরা আরও গঠনমূলক হবে। তারা ইন্টারনেটের ব্যবহার সীমিত করে লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হলে তাদের পরীক্ষার ফল ভালো হবে এবং দেশে শিক্ষার মান বাড়বে।

এমনিতেই দেশে উচ্চশিক্ষার মানের গতি নিম্নমুখী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব গ্রাজুয়েট বের হচ্ছেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, তাদের সার্বিক মান ভালো নয়। আর ভালো হবেই বা কী করে! একে তো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব থাকায় ভালো শিক্ষকের দুর্ভিক্ষ চলছে; তার ওপর ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আসছে, তারাও প্রত্যাশা অনুযায়ী মানসম্পন্ন হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তো আর আলাদিনের জাদুর চেরাগ নেই যে স্কুল থেকে উপযুক্ত হয়ে না এলেও শিক্ষার্থীদের দুর্বল শিক্ষক দিয়ে রাতারাতি মান বাড়িয়ে দেবে। স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা কেমন মান নিয়ে আসছে, তার নমুনা ইতিপূর্বে এ পত্রিকায় আমার কলামে একাধিকবার লেখা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে 'স্কুলমাঠে' জিপিএ ফাইভের আকর্ষণীয় ফলন হলেও ওইসব জিপিএ ফাইভধারী শিক্ষার্থী মান অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে।

সাম্প্রতিক উদাহরণ দিলে এসএসসি ও এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের মান সম্পর্কিত ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ বছরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৮০ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস নম্বর পায়নি। এরা স্কুল থেকে বাংলা বা ইংরেজি ভাষার কোনোটিই ভালোভাবে শিখে আসতে পারছে না। কারণ, উপরোক্ত পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষার ৩০ নম্বরের মধ্যে ৮ (পাস নম্বর)-এর কম নম্বর পেয়েছে যথাক্রমে ৫৫ ও ৫৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী। অবনতির নিম্নগতি অব্যাহত থাকায় এ বছর ঢাবির 'গ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার্থীরা ফেলের রেকর্ড করেছে। এ পরীক্ষায় ১ হাজার ২৫০টি আসনের জন্য ৪২ হাজার ১২৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিল ৪০ হাজার ২৩৪ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ২২১ জন পাস এবং ৩৮ হাজার ১০ জন ফেল করেছে। পাসের হার ৫.৫২ এবং ফেলের হার ৯৪.৪৮ শতাংশ। ভর্তি পরীক্ষার এমন ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়ার নিম্নমান প্রতিফলিত হয়েছে।

সরকার উচ্চশিক্ষার গুণগত মান প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করতে যাচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে প্রবর্তন করতে যাচ্ছে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা। এগুলো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু স্কুলপর্যায়ে ভালো ছাত্র তৈরি না হলে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেবল উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণ করলেই তো উচ্চশিক্ষার মান উন্নত হবে না। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থী হিসেবে মেধাবী ছাত্রছাত্রী পেতে হবে। আর মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি হয়ে আসে স্কুল-কলেজ পর্যায় থেকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার মান প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সেজন্য স্কুলপর্যায়ের লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করার লক্ষ্যে তাদের মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্তিমুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, রাজনীতি ও সমাজে সহনশীলতা, শৃংখলা, সুশাসন ও স্বাভাবিকতা না থাকলে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য শত নীতিমালা ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করলেও তা কাজ করবে না।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com